বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ আদি -মধ্য যুগ

শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়

সূচনা

আজ থেকে আনুমানিক হাজার বছর আগে পূর্বদেশীয় প্রাকৃতের কোনও একটি অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছিল। সেই হিসাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের পুরানো। এই এক হাজার বছর ধরে সাহিত্য সৃষ্টির ধারাটি যে সমান গতিতে প্রবাহিত হয়েছিল তা নয়। প্রথম দিকে তা ছিল নিতান্তই ক্ষীণ ও দুর্বল একটি ধারা মধ্যে মধ্যে সে ধারাও শুষ্কপ্রায় হয়ে আশ্রয় নিয়েছে বিস্মরণের বালুকারাশির ভিতর। আবার মাঝে মাঝে এসেছে নব ভাবের জোয়ার। নতুন উদ্দীপনায় সাহিত্য হয়েছে শতধার ও দুকূলপ্লাবী। এই বৈচিত্র্যময় ইতিহাসকে সুস্পষ্ট দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১) আদি ও মধ্য যুগ - কালসীমা দ্বাদশ-ত্রয়োদশ সন্ধিকাল থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত।

২) আধুনিক যুগ - উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত তা বহমান।

পরিমাণ, বৈচিত্র্য ও গভীরতা সব দিক দিয়েই দ্বিতীয় ভাগটি অনেক উচ্চ শ্রেণীর। প্রথমাংশের সাহিত্য স্থানিক গন্ডীতে আবদ্ধ। দু চারটি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশই লঘু। দ্বিতীয়াংশ-এর বাংলা সাহিত্য বিমানদন্ডে বিচার্য। বিমানদন্ডে উত্তীর্ণ।

বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগ

? আদিযুগ

(তুর্কি আক্রমণের আগে)

তুর্কি আক্রমণের কাল আঃ

১১৯৯-১২০২

? মধ্যযুগ

(পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী)

দেশ - কালের বিচার করবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার এই সাহিত্যের দেশ কি ছিল। সেই দূর অতীতে আজকের পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশ কিছুই ছিল না। বাংলা নামটিই তৈরী হয় নি। তাই রাজনৈতিক বিভাগ নয়, ভাষাসম্প্রদায়ের ভূমিকেই বাংলা সাহিত্যের দেশ বলা দরকার। আজকের হিসাবে এর মধ্যে পূর্ব ভারতের অনেকখানি অঞ্চল এবং সমগ্র বাংলাদেশ থাকছে।

আদি নিদর্শন - তুর্কি আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বকালের কথা। পূর্বভারতের এক শ্রেণীর পরিব্রাজক বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকের হাতে বাংলা ভাষার প্রথম লিখিত সাহিত্যের উৎপত্তি হল। তখনও বাংলা ভাষা তার নিজস্ব অ াকার নেয় নি। তার মধ্যে অপভ্রংশের লক্ষণগুলিই তখনও বেশী প্রকট। তবু ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে বাংলার অভ্রান্ত কিছু স্বরূপলক্ষণ পন্ডিতেরা এর মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন।

বৌদ্ধ সহজিয়াদের এই গোষ্ঠীটি স্থানীয় ভাষায় হেঁয়ালী করে নিজেদের সাধনপদ্ধতির কথা লিখে রেখেছিলেন। সাহিত্যসৃষ্টির সচেতন উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না। তবু বোধহয় অবচেতনে কবিত্বের একটা সংস্কার তাঁদের মধ্যে কাজ করছিল। তাই এই হেঁয়ালি ছড়াগুলিতেও ছন্দ আছে। আর ভাষার মধ্যে উপমা অলংকারের ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে রয়েছে সমকালীন জীবন পরিবেশের খন্ডচিত্র।

একটি উদাহরণ —

কাহেরে ঘিনি মেলি আছছ কীস।
বেড়িল হাক পড়অ চৌদীস।।
অপনা মাসে হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু আহেরি।।
তিন ন জুপই হরিণা পিবই ন পানী।
হরিণা হরিণীর নিলঅ ন জানি।।
হরিনী বোলাঅ সুন হরিণা তো।
এ বন ছাড়ী হোহু ভান্তো।।
তরংগেতে হরিণার খুর ন দীসই।
ভুসুকু ভনই মূঢ় হিঅহি ন পইসই।।

তুর্কি আক্রমণ ও সাহিত্যে তার প্রতিক্রিয়া

সেন বংশীয় রাজা লক্ষণ সেনকে হারিয়ে বখতিয়ার খিলজি বাংলা দখল করলেন ত্রয়োদশ শতকের সূচনায়। এর পরবর্তী প্রায় দুশো বছর বাংলা সাহিত্যের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ভাবতে অবাক লাগে যে এতদিন ধরে একটা জাতির আত্মপ্রকাশ কি করে হয়েছিল? যুক্তি বলে, নিশ্চয়ই তা ছিল না। হয়ত বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে ছড়া পাঁচালি ব্রতকথা নৃত্য গীতের মাধ্যমে লোকসাহিত্যের একটা প্রবাহ বইত। হয়ত তা ছিল মৌখিক। এইভ াবেই তলে তলে তৈরী হচ্ছিল বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী অবয়ব। কিন্তু উল্লেখযোগ্য লিখিত সাহিত্য ছিল না। কারণ লেখবার পরিবেশ তখন দেশে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

একালের লেখকেরা বই ছাপেন। তাঁদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন অগণিত পাঠকসাধারণ। সেকালে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার হয় নি। বই ছাপা হত না। লেখকেদের ভরণপোষণ করাতেন রাজা জমিদারেরা। বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাস, শ্রীহর্ষের সভায় বানভট্ট, লক্ষণ সেনের সভায় জয়দেব প্রভৃতিরা যেমন ছিলেন, গ্রাম্য জমিদারদের ছোট সভায় ছোট ছোট দেশজ কবিরা সেইরকমই আশ্রয় পেতেন। মুসলমান আক্রমণে রাজা জমিদ ারদের এই পুরনো ঘরগুলি ভেঙে গেল। যার নিজেরই ধনপ্রাণের নিরাপত্তা নেই

সে সভাকবি পুষবে কেমন করে। বাংলা সাহিত্য তাই দেড়শ-দুশ বছরের মত অনাথ হয়ে রইল।

চতুর্দশ শতকের শেষাশেষি এসে দেখা গেল হাওয়া ঘুরেছে। দেশে এসেছে স্থিতি। পাঠান শাসককুল এদেশেটাকেই নিজের দেশ বলে মেনে নিয়েছেন এবং বিভেদ সত্বেও হিন্দুমুসলমানে একধরণের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সমাজে এসেছে। মধ্যযুগের এই বাংলায় একটা আশ্চর্য জিনিস এই ছিল যে যদিও রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল মুসলমানের হাতে, সাংস্কৃতিক জগতে কিন্তু ছিল হিন্দুর একাধিপত্য। এবং এই ব্যবস্থায় শাসককুলের কোনও অ াপত্তি তো ছিলই না, বরং ক্ষেত্রবিশেষে সহায়তা ছিল। হিন্দু কবিরা মুক্ত কণ্ঠে তাই বলে গেছেন - সুলতান হুসেন শাহ নৃপতিতিলক।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের উত্থান

চর্তুদশ শতকের শেষাশেষি বাংলা সাহিত্য তার অজ্ঞাতবাস থেকে পূর্ণ মহিমায় বেরিয়ে এল। ভাষার পরিণত রূপ এবং সাহিত্যের শাখাপ্রশাখা বিস্তার বুঝিয়ে দেয় মধ্যবর্তী মুছে যাওয়া সময়টিতে সাহিত্যসৃষ্টি বন্ধ ছিল ন া। এর পরের চারশ বছর মোটামুটি একই গতিপথে বাংলা সাহিত্য প্রবাহিত হয়েছে। এই চারশ বছরের বাংলা সাহিত্যকে আমরা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বলে থাকি।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের লক্ষণ ।।

এই সাহিত্যের বিশিষ্ট কতকগুলি লক্ষণ আছে।

১) সব রকম রচনাই লেখা হত পদ্যে। দলিল দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র ছাড়া গদ্যের ব্যবহার ছিল না।

২) হাতে লেখা পুঁথির কপিরাইট ছিল না। পাঠবিশুদ্ধি রক্ষার কথা কেউ ভাবতেন না। প্রতি নকলে মূল রচনার ইচ্ছামত বদল ছিল অতি স্বাভাবিক ব্যাপার।

৩) লেখকেরা পৃষ্ঠপোষক রাজা জমিদারের অভিপ্রায় অনুসারে লিখতেন। বিষয় নির্বাচনে তাঁরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন না।

৪) কথকঠাকুরেরা পুঁথি নকল করিয়ে গ্রাম্য আসরে গীতবাদ্যসহ তা শ্রোতাদের শোনাতেন। বই পড়বার রেওয়াজ বিশেষ ছিল না।

৫) লিপিকরেরা পুঁথি নকল করবার সময় ভাষার পুরনো রূপ বদলে সব সময়েই আধুনিক করে দিতেন। সেইজন্য প্রায় কোনো প্রাচীন লেখকেরই নিজস্ব ভাষা আজ আর পাওয়া যায় না।

৬) অল্প শক্তিমান কবিরা প্রায়ই খ্যাতিমান পূর্বসুরীর নামে নিজেদের রচনা চালিয়ে দিতেন। মূল কবির রচনা কতটুকু তা খুঁজে বের করা আজকের দিনের গবেষকদের একটা বড় কাজ।

৭) মুষ্টিমেয় দু একটি ইসলামি রোমান্টিক গল্প এবং মৌখিক লোকসাহিত্য ছাড়া যা কিছু লেখা হয়েছে সবই কোনো না কোনোভাবে ধর্মকেন্দ্রিক।

৮) নূতন গল্প উদ্ভাবনের রীতি ছিল না। প্রতি সাহিত্যশাখায় একই গল্প নিয়ে বিভিন্নজনে বিভিন্নভাবে লিখেছেন।
৯) শিক্ষিতজনেরা সকলেই ভালো করে সংস্কৃত শিখতেন এবং বাঙালী মনীষার একটা বড় অংশ সেই ভাষাতেই ব্যক্ত হয়েছে, বাংলায় নয়।
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শাখা প্রশাখা
এই সাহিত্যের বিভাগগুলি ছিল মোটামুটি নিম্নলিখিত প্রকার —

অতি সংক্ষেপে এদের পরিচয় দেওয়া যাক।

গীতি সাহিত্য বৈষ্ণব পদাবলী
এটিই মধ্যযুগের সবচেয়ে গৌরবময় সাহিত্যশাখা। প্রেমের কবিতা হিসাবে কোন কোন রচনা আজও আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। এর উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস এই রকম
সংস্কৃত ও প্রাকৃতভাষায় ছোট ছোট প্রেমের কবিতা লেখবার একটা প্রথা ভারতবর্ষে অতীতকাল থেকে প্রচলিত ছিল। তাকে বৈষ্ণবের ইষ্টদেবতা রাধাকৃষ্ণের মাধ্যমে ভক্তিরসে ঈষৎ জারিত করে নূতনতর কাব্য রচনা করেছিলেন জয়দেব। সেই কাব্যের নাম গীতগোবিন্দ। কবির নিজের ভাষায় গীতগোবিন্দের দুটি উদ্দেশ্য , এক হরিস্মরণ (যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ) দুই প্রেমলীলা উপভোগ (যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং)। এই ইঙ্গিতটি পরবর্তীকালে গ্রহণ করলেন মিথিলার বিদ্যাপতি, বঙ্গের কালিদাস এবং আরও কেউ কেউ। রূপকল্প তাঁরা নিলেন জয়দেব থেকে আর রাধাকৃষ্ণের মামুলি গল্পে সম্ভোগের বদলে প্রাধান্য দিলেন বিরহকে। বিরহিনী রাধিকার আর্তিতে মিশে গেল ভগবানের জন্য ভক্তের প্রার্থনা। লৌকিকে অলৌকিক মেশা এই আশ্চর্য প্রেমগাথা বাঙালীকে বিহ্বল করে রাখল শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে।
বৈষ্ণব পদাবলী দুরকম ভাষায় লেখা হয়েছিল। এক বিশুদ্ধ বাংলা - যার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ মেলে চন্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের রচনায়। দুই ব্রজবুলি, যার প্রধান কবি বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস কবিরাজ প্রভৃতি। এই ব্রজবুলি একটি কৃত্রিম ভাষা। শুধু রাধাকৃষ্ণপদ রচনা করবার জন্যই ব্যবহৃত হত বলে পরবর্তীকালে এর নামকরণ হয়েছিল ব্রজবুলি। আসলে এটি পূর্বদেশীয় অপভ্রংশ অবহট্‌ঠের একটি প্রকারভেদ। এর ব্যাকরণ সহজ এবং ধ্বনি অতি মধুর।
বৈষ্ণব পদাবলীর নমুনা হিসাবে দুই রীতির দুটি পদ (খন্ডকবিতা) আংশিক উদ্ধৃত করা হল।
১) বিদ্যাপতির ব্রজবুলি পদ, বিষয় - রাধাবিরহ।
এ সখি হমারি দুখের নাহি ওর ।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।।
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ভাটি যাওত ছাতিয়া।।
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী।

অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিনরাতিয়া।।
২) চন্ডীদাসের পদ, প্রেমবিদ্ধা রাধার উক্তি
কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।।
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।।
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পীরিতি।।
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এবং সম্ভবতঃ বাঙালী সমাজেও সবচেয়ে বড় ঘটনা হল শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব (১৪৮৬-১৫৩৩)। মাত্র আটচল্লিশ বছরের জীবৎকালে তিনি চবিবশ বছর পর্যন্ত ছিলেন সংসারে। পরবর্তী ছ বছর ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসীরূপে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের পথে পথে এবং শেষ আঠারো বছর নীলাচলে গুণ্ডিচা বাড়িতে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর সাধকরূপে। তিনি নতুন কোন ধর্ম প্রচার করেননি। কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি। তবু তাঁর জীবন ও সাধনা অবলম্বন করে এদেশে বৃহৎ একটি ভাবধারা গড়ে উঠেছিল। তাঁর প্রভাবে
১) পদাবলিসাহিত্যে এক নতুন ভাবের জোয়ার আসে, যার ফল হল
ক) তাঁকে নিয়ে অনেক উৎকৃষ্ট পদ লেখা হল।
খ) রাধাকৃষ্ণ পদে আধ্যাত্মিক ভাবব্যঞ্জনা প্রধান হয়ে উঠল।
গ) কীর্তন গানের ব্যাপক প্রসার ঘটল।
২) তাঁকে অবলম্বন করে জীবনীসাহিত্যের সূচনা হল।
৩) তাঁর ভাবধারা নিয়ে প্রথমে নীলাচল এবং পরে বৃন্দাবনে এক ভক্ত দার্শনিকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থগুলির দ্বারা বাঙালীর মনীষা বঙ্গের বাইরে বিস্তৃত হয়।

গীতি সাহিত্য শাক্ত পদাবলী
সপ্তদশ শতকের শেষভাগ থেকে বৈষ্ণবপদাবলী গতানুগতিক হয়ে পড়লে বাংলা গীতিসাহিত্যে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল তা অনেকাংশে পূরণ হল শাক্তপদাবলীর দ্বারা। এই শাখার উদ্ভব ও বিলয় দুটোই অষ্টাদশ শতকে।

সপ্তদশ শতকের শেষভাগ থেকে বৈষ্ণবপদাবলী গতানুগতিক হয়ে পড়লে বাংলা গীতিসাহিত্যে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল তা অনেকাংশে পূরণ হল শাক্ত পদাবলীর দ্বারা। এই শাখার উদ্ভব ও বিকাশ দুটোই অষ্টাদশ শতকে। তখন বাঙালীর জীবনে এসেছে এক সংকটের কাল। তখন মোগলের কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে গেছে। বাংলার মাটিতে ইংরেজ ক্রমশঃ ঘাঁটি গড়ছে। চারিধারে মাৎসন্যায়ের প্রবল প্রতাপ। আজ যে রাজা কাল সে ভিখারী। অনিশ্চয়ের এই বাতাবরণে শক্তিপূজার প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়বে এটাই স্বাভাবিক। এই পরিপ্রেক্ষিতে শাক্ত সাধক রামপ্রসাদ সেন এক নতুন ধরণের গান রচনা করলেন। যেন তিনি মা কালির আপন সন্তান। আদর আবদার গালি অভিমান বৈরাগ্য সব মেশানো এক বিচিত্র মনোভাব নিয়ে তিনি মায়ের পায়ে সর্বস্ব সমর্পণ করছেন। আপন গানের উপযোগী ভাষা ও সুরও তিনি নিজেই তৈরী করে নিলেন। সহজ সরল প্রাণগলানো এই গানগুলি বাংলা সাহিত্যের চিরস্থায়ী সম্পদ। অন্যান্য শাক্তকবিরা সকলেই অল্পবিস্তর রামপ্রসাদকে অনুসরণ করে গেছেন।

রামপ্রসাদী গানের একটি উদাহরণ —

কেবল আসার আশা ভবে আসা আসা মাত্র হল।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো।।
মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় করে ছলো।
ওমা মিঠার লোভে তিত মুখে সারাদিনটা গেলো।।
মা খেলবি বলে ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলে।
এবার যে খেলা খেলালে মাগো আশা না পুরিল।।
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায় যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো।।

জীবনীসাহিত্য চৈতন্যজীবনী

মধ্যযুগের বাংলায় মানুষের কাহিনী লেখবার রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যকে তাঁর ভক্তজনেরা মানুষ মনে করতেন না। মনে করতেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার। জনমানসে এই ধারনা তিনি বেঁচে থাকতে থাকতেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। তারই ফলস্বরূপ একটি মৌলিক সাহিত্য শাখার উদ্ভব হল — চৈতন্য জীবনী শাখা।

প্রথমে সংস্কৃত ভাষাতে এই ধরণের একাধিক বই লিখিত হয়। তারপর তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তীকালে বাংলাতেও তা লেখা হতে লাগল। তাঁর অনেক জীবনীগ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা দুটি —

১) বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত (রচনাকাল আনুমানিক ১৫৪৮)

২) কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত (রচনাকাল ১৫৯২ থেকে ১৬০০ র মধ্যে)

চৈতন্যভাগবতে প্রধান হয়েছে গৌরাঙ্গের বাল্য ও গার্হস্থ্য জীবন। কবি যে বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তাই তা হয়েছে মানব রসে সমৃদ্ধ ও গভীর। দ্বিতীয়টিতে প্রধান হয়েছে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস জীবন। মহাপ্রভুর জীবন ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন দুটিকে একসূত্রে গেঁথে এই গ্রন্থে লেখক পরিবেশন করেছেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ রচনা কোনটি যদি এ প্রশ্ন ওঠে তাহলে নিঃসন্দেহে সেই গৌরব কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃতের প্রাপ্য । পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের এইরকম মণিকাঞ্চন যোগ খুবই বিরল। কৃষ্ণদাস তাঁর সারা জীবনের সাধনা নিয়ে শেষ জীবনে এই বইখানি লেখেন। প্রভুর প্রথম জীবন বৃন্দাবন দাস সবিস্তারে লিখেছেন বলে তিনি পূর্বসূরীর গৌরব অক্ষুন্ন রাখবার জন্য বিনয়বশতঃ সে অংশ সংক্ষেপে লিখেছেন। কিন্তু পরবর্তী অংশ, যা বৃন্দাবন দাস লেখেন নি সেখানে তিনি সঞ্চিত জ্ঞানভান্ডার উজাড় করে দিতে কার্পণ্য করেন নি। বৈষ্ণবদর্শন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি হিন্দুদর্শনের আকর গ্রন্থগুলি থেকে প্রাসঙ্গিক অজস্র উদ্ধৃতি দিয়েছেন। স্বরচিত বহু সংস্কৃত শ্লোকও গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন। ফলে শুধু জীবনী নয়, দর্শনগ্রন্থ হিসাবেও এর মূল্য অনেক। কৃষ্ণদাসের রচনার উদাহরণ হিসাবে মহাপ্রভু রায়রামানন্দ কথোপকথনের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা গেল।

প্রভু কহে রামানন্দ করেন উত্তর।
এইমত সেই রাত্রি কথা পরস্পর।।
প্রভু কহে কোন বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার।
রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিন বিদ্যা নাহি আর।।
সম্পত্তি মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি।
রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী।।
দুঃখমধ্যে কোন দুঃখ হয় গুতর।
কৃষ্ণভক্তি বিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর।।
মুক্তমধ্যে কোন জীব মুক্ত করি মানি।
কৃষ্ণপ্রেম সাধে সেই মুক্ত শিরোমণি।।
মুক্তি ভক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দোঁহার স্থিতি।
স্থাবরদেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি।।
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে।।
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুস্কজ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান।।

আখ্যায়িকা কাব্য পুরানাশ্রয়ী অনুবাদ

রামায়ন, মহাভারত ও ভাগবত (আংশিক) এই তিন পুরানকথা অবলম্বনে মধ্যযুগে বিস্তর আখ্যায়িকা কাব্য লেখা হয়েছিল। তবে আজকের দিনে আমরা অনুবাদ বলতে যা বুঝি এগুলি তা নয়। এদের লক্ষণ হল

১) এগুলি আদৌ আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ।

২) মূল কাহিনীর প্রভূত পরিবর্তন, বহু উপাখ্যানের প্রবেশ, বহু প্রসঙ্গ বর্জন।

৩) চরিত্র ও ঘটনায় মূল মহাকাব্যের সমুন্নতি নেই। পরিবর্তে আছে সমসাময়িক সমাজজীবনের প্রচলিত মূল্যবোধ ও দূরাগত ছায়া।

৪) এগুলি আসলে পুরানাশ্রয়ী পাঁচালি। কবিরা নিজেরাও তাই মনে করতেন।

রামায়ণ ।।

এ শাখার সবচেয়ে বড় কবি কৃত্তিবাস ওঝা। তাঁর ব্যক্তিপরিচয়, রচনাকাল ও পৃষ্ঠপোষক রাজার নাম কোন কিছুই সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না, যদিও সে সব নিয়ে বিস্তর গল্প চলিত আছে। যেটুকু মোটামুটি জানা যায় তা এই যে কবি সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকের লোক ছিলেন। কোন হিন্দু রাজা বা বড় জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি রামায়ন লিখেছিলেন এবং কবি খুবই প্রতিভাশালী ছিলেন। সহজ সরল রচনার গুণে তাঁর কাব্য অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। সেই জনপ্রিয়তার ফলে তাঁর পুঁথির অনেক নকল হয়েছে এবং তাঁর নিজস্ব ভাষা আজ আর একটুও খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু পঞ্চদশ শতাব্দীর খাঁটি ভাষাটা না পেলেও তাঁর রচনার খাঁটি স্বাদ অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকের অন্তরাত্মার হদিশ সেখান থেকে পেতে কোন অসুবিধা হয় না।

তাঁর পরে আরও অনেক কবি রামায়ণ লিখেছেন। কিন্তু তাঁর তুল্য খ্যাতি আর কারও হয়নি বরং কথকঠাকুরদের হাতে অন্য অনেকের রচনার উৎকৃষ্ট অংশ কৃত্তিবাসী রামায়ণের মধ্যে ঢুকে গিয়ে কৃত্তিবাসের পরিচয়ে বেঁচে আছে।

মহাভারত

মহাভারত শাখার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হলেন কাশীরাম দাস। ষোড়শ শতকের উপান্তে এসে তাঁর কাব্য রচিত হয়েছিল বলে পন্ডিতেরা মনে করেন।

কাশীরামের আগে এবং পরে অনেকেই মহাভারতের সামগ্রিক বা আংশিক অনুবাদ করেছিলেন বটে, কিন্তু রচনাগুণে তাঁরা কেউই কাশীরামের সমকক্ষ ছিলেন না। অথচ লোকপ্রবাদে জানা যায় কাশীরামও সমস্ত কাব্যটি একা হাতে লেখেন নি। আদি, সভা, বন ও বিরাটপর্ব লেখবার পর তাঁর মৃত্যু হয়, বাকি অংশ শেষ করেন তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র।

কিন্তু ঘটনা যাই হোক মধ্যযুগের বাংলা ভারত পাঁচালির অবিসম্বাদী সম্রাট রূপে আজও কাশীরাম দাসই স্বীকৃত কবি। পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের অপূর্ব সম্মেলনে তাঁর রচনা হৃদয়গ্রাহী। দুরূহ মহাভারত কথাকে সর্বসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে এনে দিয়েছিলেন বলে মধুসূদন তাঁকে গঙ্গা আনয়নকারী ভগীরথের সঙ্গে তুলনা করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

ভাগবত

ভাগবতের সামগ্রিক অনুবাদ মধ্যযুগে হয় নি। দশম থেকে দ্বাদশ যেখানে কৃষ্ণকথা আছে সেইটুকুরই অনুবাদ হয়েছে বার বার। কবিরাও তাঁদের কাব্যকে শ্রীকৃষ্ণবিজয়, কৃষ্ণমঙ্গল ইত্যাদি নাম দিয়েছেন, ভাগবত বলেন নি।

এই শাখার প্রথম কবির নাম মালাধর বসু। তাঁর কবিত্বে প্রীত হয়ে সুলতান তাঁকে গুণরাজ খান উপাধি দিয়েছিলেন। কবি পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের লোক। প্রাক্ চৈতন্য যুগে তাঁর কাব্য লেখা হয়েছিল। বঙ্গে বৈষ্ণব ভাবধারার জোয়ার আসবার আগেই তিনি কৃষ্ণকথা লিখে তার আগয়নী রচনা করেছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সেজন্য তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন।

লৌকিক পাঁচালি কাব্য মঙ্গলকাব্য

বাংলায় লৌকিক পাঁচালি কাব্যের ধারাটি সুবিশাল এবং বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত। এদের উৎপত্তিমূলে আমাদের সামাজিক ইতিহাসের একটি অধ্যায় প্রচ্ছন্ন আছে। ইতিহাসটি এইরকম।

পূর্বভারতে আর্য সংস্কৃতি বিস্তারের অনেক আগে থেকেই আর্যেতর সমাজে নানারকম লৌকিক দেবদেবীর (বিশেষতঃ দেবীদের)

পূজা প্রচলিত ছিল। আর্যীকরণের পরে সমাজের উপরতলায় আর্য পূজা পদ্ধতি ও অন্যান্য সংস্কার আচরিত হলেও অন্ত্যজ সমাজে, বিভিন্ন কৌমে, এমন কি উচ্চবর্ণের অন্তঃপুরে স্ত্রী সমাজে এইসব লৌকিক দেবদেবীরা পূজিত হতেন। এঁদের বিষয়ে ছড়া পাঁচালি ব্রতকথা বলা হত। সমাজের ওপরতলায় এঁদের সম্বন্ধে যে অবজ্ঞা ছিল তার প্রমাণ মেলে চাঁদসদাগরের মনসার প্রতি ঘৃণার, বা ধনপতি সদাগরের চন্ডীর ঘটে লাথি মারার ঘটনায়। তুর্কি আক্রমণের পরে সমাজের ঘোর অরাজক অবস্থার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলে গেল।

১) জনসাধারণের মনে হল শিবের মত সাত্বিক আত্মভোলা দেবতা দিয়ে এই বিপদের মধ্যে কোন কাজ হবে না। এমন দেবতা চাই যিনি সূক্ষ্ম ন্যায়বিচার ছেড়ে সচল ও সক্রিয় হবেন শুধুমাত্র ভক্তের স্বার্থে।

২) মুসলমান শাসনাধীনে হিন্দু প্রজার অস্তিত্বের সংকট দেখা দিলে সমাজপতিরা অস্পষ্টভাবে অনুভব করেছিলেন হিন্দু সমাজের অন্তেবাসী অংশগুলিকে মূল স্রোতের অন্তর্গত করা দরকার।

এই দুই ধারণা একত্রিত হয়ে বাংলা সাহিত্যে একটা নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়ে দিল। অন্ত্যজ জাতির দেবতারা আর অস্পৃশ্য রইলেন না। এঁরা রাতারাতি পৌরাণিক দেবপরিবারের সদস্য হয়ে গেলেন। চন্ডী হলেন শিবের পত্নী, মনসা শিবের কন্যা এইরকম। সংস্কৃত জানা সুশিক্ষিত কবিরা এঁদের নিয়ে পুরাণকথার ছাঁচে বৃহৎ কাব্য লিখতে লাগলেন। এইভাবে ব্রতকথা উন্নীত হল কাব্যকথায়। এগুলিই মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। প্রধান মঙ্গলকাব্য তিন রকম। অপ্রধান অসংখ্য।

মনসামঙ্গল

চম্পকনগরের বণিকশ্রেষ্ঠচাঁদ সদাগরকে দিয়ে মর্তে পূজা প্রচার করবেন এই ছিল মনসার ইচ্ছে। কিন্তু চাঁদ মনসার ঘোর বিরোধী। তিনি কোনমতেই সাপের দেবী মনসার পূজা করতে রাজি নন। এই চন্দ্রধরকে জব্দ করতে মনসা তার বন্ধুকে হত্যা করেন, ছলে তাঁর মহাজ্ঞান হরণ করেন, তার ছয় ছেলেকে মেরে ফেলেন, সপ্তডিঙা মধুকর নৌকার বহর সাগরজলে ডুবিয়ে দেন শেষে এর ছোট ছেলে লক্ষীন্দরকে বিয়ের রাতে বাসরঘরে মেরে ফেলেন। তবু চাঁদ অনড়।

এদিকে লক্ষীন্দরের নববধূ বেহুলা তার স্বামীর মৃত্যু মেনে নিল না। সে তার মৃত পতির শব কলার ভেলায় নিয়ে গাঙুর নদী দিয়ে
ভেসে চলল স্বর্গের উদ্দেশ্যে। পথে অনেক পরীক্ষা দিতে হল তাকে। সেই আশ্চর্য জলযাত্রার শেষে সে স্বর্গে পৌঁছাল। নিজের নাচ দেখিয়ে দেবতাদের সন্তুষ্ট করে লক্ষীন্দরের জীবন ফিরে পেল।
তারপর সে ফিরে এল স্বদেশে। তার অনুরোধে এতদিন পরে চাঁদ সদাগর মনসার পূজা করলেন। অবশ্য বাঁ হাতে অত্যন্ত উপেক্ষায়। মনসা অগত্যা তাই মেনে নিলেন। কাহিনী সমাপ্ত হল।

চাঁদ সদাগরের এই মর্মস্পর্শী কাহিনীতে উন্নত সাহিত্যের অনেক উপাদান ছিল। তার সদ্ব্যবহার করেছেন আধুনিক লেখকেরা। মধ্যযুগের লেখকেরা কিন্তু চাঁদের দৃঢ়তার মধ্যে শুধুই গোঁয়ার্তুমি দেখেছেন আর বেহুলার অলৌকিক জলযাত্রার রোমান্টিক সৌন্দর্য্য তাঁদের মনে কোন দাগ কাটেনি। তাঁরা মোটা দাগের হাসি ও কান্না দিয়ে এই গল্প লিখে গেছেন সেকালের গ্রাম্য শ্রোতাদের জন্য। এই শাখার প্রধান কবিরা হলেন

১) বিজয়গুপ্ত আনুমানিক ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে কাব্য লেখেন। জন্মস্থান পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলায়।

২) বিপ্রদাস পিপিনাই - রচনাকাল আনুমানিক ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণার বাদুড়িয়ায় জন্ম।

(এই কবির জন্ম ও রচনাকাল নিয়ে অনেকে সন্দেহ করেন।)

৩) নারায়ণ দেব - রচনাকাল ১৫৯৫ খৃঃ, শ্রীহট্টের বোরগ্রামে জন্ম ।

৪) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ - সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি। বর্ধমান জেলা।

চন্ডীমঙ্গল

চন্ডী দেবীর পরিকল্পনায় ওঁরা ওদের শিকারের দেবী চন্ডী স্ত্রী সমাজে প্রচলিত ব্রতকথার মঙ্গলচন্ডী, এবং পৌরাণিক চন্ডীদেবীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। মঙ্গলকাব্যে এঁকে নিয়ে দুটি কাহিনী দেখতে পাই।

১) মর্ত্যে নিজ পূজা প্রচারের জন্য চন্ডী ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে ব্যাধের ঘরে নবজন্ম নেওয়ান। এই ছেলের নাম হয় কালকেতু। যৌবনে সে মহাবীর হয়ে ওঠে যখন নির্বিচারে বনের পশু মেরে সাবাড় করছিল তখন চন্ডী একদিন কালকেতু ও তৎপত্নী ফুল্লরার সংসারে উপস্থিত হয়ে সাতঘড়া ধন দিয়ে তাকে গুজরাট রাজ্যের রাজা করে দেন। প্রতিবেশী কলিঙ্গ রাজের সঙ্গে তার প্রথমে কিছু যুদ্ধবিগ্রহ হয়। কিন্তু পরিণামে তারই জয় হয় এবং চন্ডীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

২) উজানিনগরে ধনপতি সাধু মস্ত বড় বণিক । তার দুই স্ত্রী লহনা ও খুল্লনা। এই খুল্লনা আসলে শাপভ্রষ্ট অপ্সরা। মর্ত্তে নিজ পূজা প্রচারের জন্য চন্ডী তাকে ধনপতির বউ করে পাঠিয়েছেন। খুল্লনাকে একদিন গোপনে চন্ডীপূজা করতে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ধনপতি পূজার ঘটে লাথি মারেন। এই অপরাধের শাস্তি দেবার জন্য চন্ডী ফাঁদ পাতেন । সমুদ্রপথে বাণিজ্যে যেতে যেতে ধনপতি দেখলেন সাগরের মাঝখানে এক অপূর্ব শতদল। তার মাঝখানে বসে আছেন এক পরমাসুন্দরী দেবী। আকাশ থেকে শ্বেতহস্তী এসে বার বার তাঁর মুখে প্রবেশ করছে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে। এই দেবী আসলে চন্ডীর মায়া । এর নাম কমলেকামিনী। ধনপতি সিংহলে পৌঁছে সেখানকার রাজার কাছে এই গল্প করলে রাজা স্বভাবতই বিশ্বাস করলেন না। ফলে রাজা কষ্ট হয়ে ধনপতির টাকাকড়ি বাজেয়াপ্ত করলেন, আর তাকে নিক্ষেপ করলেন কারাগারে।

অনেকদিন পরে ধনপতির শিশুপুত্র শ্রীমন্ত বড় হয়ে পিতার সন্ধানে সিংহলে আসে। ভক্ত ও বিনয়ী এই কিশোরকে দেবী কৃপা করতেন। তারই ফলে শ্রীমন্ত পিতাকে উদ্ধার করে, হৃতসম্পত্তি ফিরে পায় এবং সিংহলরাজের দুই কন্যাকে বিয়ে করে সসম্মানে দেশে ফিরে আসে। বণিকসমাজে অতঃপর চন্ডীপূজা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়।

চন্ডীমঙ্গল কাহিনীর বৈশিষ্ট্য

আপাতদৃষ্টিতে এই গল্প দুটি অত্যন্ত সাদামাটা ও রূপকধর্মী। কিন্তু কবিরা এরই শাখা প্রশাখা শিরা উপশিরায় প্রাণ সঞ্চার করেছেনঅত্যন্ত সজীব চরিত্রসৃষ্টির দ্বারা। ব্যাধ ও বণিক দুইয়ের কাহিনী একসঙ্গে ধরলে তার মধ্যে সমাজজীবনের নানা স্তর — অন্ত্যজ ব্যাধ থেকে মহাধনী বণিক; নানা কর্ম — শিকার থেকে রাজ্যশাসন; নানা জাতি — চন্ডাল থেকে যাজক ব্রাহ্মণ এবং মুসলমান, নানা অবস্থা — শান্তি ও সুশাসন থেকে ঘোর অরাজকতা, সবই আমরা জানতে পারি। মধ্যযুগের গ্রামীণ বাঙ্গালী কেমন ছিল ইতিহাসে তা লেখা নেই বটে, কিন্তু এই ধরনের কাব্যে তাদের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ইতিহাসের চেয়েও স্পষ্ট অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রধান কবি

চন্ডীমঙ্গলের প্রধান কবি দুজন

১) দ্বিজ মাধব — রচনাকাল ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি চট্টগ্রামের লোক ছিলেন।

২) মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী — রচনাকাল আনুমানিক ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। জন্মস্থান বর্ধমান জেলা। কবির উপাধি কবিকঙ্কণ। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে ওই মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী আলাদা উল্লেখের দাবী রাখেন। কারন ওই শাখার শ্রেষ্ঠ দুই কবির মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর রচনার চরিত্রচিত্রনের নিপুনতা, জীবন সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ও প্রসন্ন দৃষ্টিভঙ্গী, চিসস্মত অনাবিল হাস্যরস এবং প্রাঞ্জল ভাষা আচে। তাঁর রচনার সামান্য নমুনা দেওয়া হল। কালকেতুর নতুন নগরে নানা বৃত্তির লোক এসেছে। তার মধ্যে চিকিৎসকও আছে প্রচুর। তাঁদের কার্যকলাপ এইরকম —

উঠিআ প্রভাতকালে উর্ধ ফোটা করি ভালে
বসন মণ্ডিত করি শীরে।
পরিআ উজ্জবল ধুতি কাখে করি লয়্যা পুথি
গুজরাটে বৈদ্যগণ ফিরে।।
জার দেখে সাধ্য রোগ ঔষধ করএ যোগ
বুকে ঘা মারিয়া অর্থ চায়।
অসাধ্য দেখিআ রোগ পলাইতে করে যোগ
নানা ছলে মাগএ বিদায়।।
বৈদ্যক জনের পাশে অগ্রদানিগণ বৈসে
নিত্য করে রোগীর সন্ধান।
রাজকর নাই দেই বৈতরনী ধেনু নেই
হেমগর্ভ তিল লয় দান।।

ধর্মমঙ্গল

ঢেকুর গড়ের বীর রাজা ইছাই ঘোষের তনী পত্নী রঞ্জাবতী পুত্রকামনায় ধর্মঠাকুরের ব্রত করছিলেন। তার কঠিন ব্রতে সন্তুষ্ট হয়ে ধর্মঠাকুর তাকে একটি মহাবীর পুত্র দিয়েছিলেন। সেই ছেলের নাম লাউসেন। ঘরে বাইরে লাউসেনের অনেক শত্রু ছিল। তাঁরা শৈশবেই তাকে মারতে চেয়েছিল। কিন্তু সফল হয়নি। শেষে তার যৌবনে শত্রুদের কুপরামর্শে স্বয়ং গৌড়েশ্বরও তাকে কৌশলে বিনাশ করার জন্য অসম্ভব নানা কাজের ভার দেন। তাতেও লাউসেনকে হারানো যায়নি। নানা যুদ্ধ জয় করে অবশেষে সে প্রতিবেশী রাজ্যের এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যাকে বিবাহ করে এবং পশ্চিমদিকে সূর্যোদয় ঘটিয়ে ধর্মঠাকুরের অঘটনঘটননাশিনী ক্ষমতার পরিচয় দেয়।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে তুলনায় ধর্মমঙ্গলের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হল

১) এটিতে যুদ্ধবিগ্রহ প্রধান অনেক উপাখ্যান আছে।

২) ধর্মঠাকুরের উৎসে বৌদ্ধ প্রভাবের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়।

৩) এটি মুলতঃ রাঢ় অঞ্চলের কাব্য । ধর্মঠাকুরও বিশেষভাবে রাঢ়দেশে পূজিত লৌকিক দেবতা।

৪) প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে নূতন।

ঐই শাখার প্রধান কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যটি সমাপ্ত করেছিলেন। তিনি বর্ধমানের লোক এবং সম্ভবতঃ মহারাজ কীর্তিচন্দ্র ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক। রচনায় কবির প্রগাঢ় পান্ডিত্যের ছাপ আছে।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্য

অষ্টাদশ শতকে এসে মধ্যযুগের সাহিত্যধারাগুলি সবই পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে গতানুগতিক হয়ে যায়। নতুনত্বের সন্ধানে লৌকিক ও পৌরানিক দেব দেবীদের নিয়ে পাঁচালির ধারায় অসংখ্য কবিযশপ্রার্থী কাব্য লিখতে থ

াকেন। সেই সব রচনা অধিকাংশই অসার। ইতিহাসের প্রবাহ রক্ষা করা ছাড়া এদের অন্য কোনো গুত্ব নেই।

ব্যতিক্রমী মঙ্গলকাব্য অন্নদামঙ্গল

এর মধ্যে নিজ মহিমায় যে বইটি আপন স্থান করে নিয়েছে তার নাম অন্নদামঙ্গল। মঙ্গলকাব্যশাখার শ্রেষ্ঠদুই লোকের একজন হলেন মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী। অপরজন অন্নদামঙ্গলের কবি রায়গুনাকর ভরতচন্দ্র রায়।

১৭০৮/১০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ হুগলী জেলার ভুরসুটে অভিজাত জমিদারবংশে কবির জন্ম হয়। কিন্তু পারিবারিক বিপর্যয়ে অল্প বয়সেই তিনি জীবনের নানা কঠিন অভিজ্ঞতার শরিক হন। রাজার ছেলে হয়েও তিনি কার াদ্ধ হয়েছিলেন এবং বিনা দেষে নানা অবমাননার প্রতিক্রিয়া স্বপ কিছুদিনের জন্য সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসীও হয়ে গিয়েছিলেন। এরই মধ্যে তিনি ফারসী ও সংস্কৃত শিখেছেন এবং সর্বশাস্ত্রে তিনি সুপন্ডিত হয়েছেন। অবশেষে প্রান্ত যৌবনে দুর্ভাগ্যের অবসানে তিনি কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সম্মানিত সভাকবি হন এবং তাঁরই অনুরোধে অন্নদামঙ্গল রচনা করেন।

অন্নদামঙ্গলের কোনো শাখা ছিল না। এই বইয়ের গল্প সম্পূর্ণ ভরতচন্দ্রের নির্মিত। তার মধ্যে পৌরাণিক লৌকিক ও ঐতিহাসিক নানা প্রচলিত উপাখ্যান অবশ্য আছে।

গ্রন্থটি বৃহৎ ও তিনখন্ডে বিভক্ত। দ্বিতীয় খন্ডে আছে বিদ্যাসুন্দরের গল্প। কবির নিন্দা ও প্রশংসা দুইয়ের সিংহভাগ এই অংশের জন্য দায়ী।

ভরতচন্দ্রের রচনার প্রধান প্রধান গুণ হল

১) অসাধারণ ভাষাসিদ্ধি। যার জন্য রবীন্দ্রনাথ তার ভাষাকে রাজকণ্ঠের মনিমালা বলেছিলেন।

২) প্রগার পান্ডিত্য। দার্শনিকতা ও উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাব

৩) হাস্যরস

৪) জীবন সম্বন্ধেএকটি তির্যক ব্যঙ্গদৃষ্টি; যার জন্য তাঁর কাব্যেকে আধুনিক সাহিত্যের লক্ষনাক্রান্ত বলা চলে।

অন্নদামঙ্গল কাব্য সমাপ্ত হয় ১৭৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে কবির মৃত্যু হয়। এই খৃষ্টাব্দটিকেই মধ্যযুগের অবসান বলে সাহিত্যের ইতিহাসে সাধারনভাবে ধরা হয়ে থাকে। এর তিন বছর আগেই ঘটে গেছে পলা সির যুদ্ধ। বঙ্গে ইংরেজ অধিকারের সূত্রপাত হয়ে গেছে। কৃষ্ণনগরের রাজসভায় বসে এ ঘটনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য কবি বোঝেন নি। কিন্তু আজ মনে হয় একশ বছর পরে জন্মালে ভরতচন্দ্রের প্রতিভা আত্মপ্কাশের আরও ভালো পথ পেতে পারত।

তাঁর রচনার নমুনা রূপে শিবের অর্ধনারীশ্বর মুর্তির বর্ণনা উদ্ধৃত করা গেল —

আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে
আধ পটাম্বর সুন্দর সাজে
আধ মনিময় কিঙ্কিনি বাজে
আধ ফণিফণা ধরি রে।
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা
আধ মনিময় হার উজালা
আধ কণ্ঠে শোভে গরল কালা
আধই সুধা মাধুরী রে।।
এক হাতে শোভে ফনিভূষণ
এক হাতে শোভে মনিকঙ্কণ
আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতুরা ভক্ষণ
আধই তাম্বুল পুরি রে।
ভাঙ্গে ঢুলু ঢুলু এক লোচন
কজ্জলে উজ্জ্বল এক নয়ন
অধে ডালে হরিতাল সুশোভন
আধই সিন্দুর পরি রে।।

যুগসন্ধি

তুর্কি আক্রমণের পর থেকে ইংরাজ অধিকার পর্যন্ত দীর্ঘ সময় বাঙ্গালীর সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনধারা মোটামুটি একই খাতে বয়েছিল। পাঠান থেকে মোগল এবং মোগল থেকে সুলতানি আমলে শুধু রাজাবদল হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গির বদল তেমন কিছু হয় নি। দেশ উত্তরোত্তর দরিদ্র ও কূপমুন্ডক হয়ে গেছে। তাই এই যুগাবসানে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে এসেই আমরা চারিদিকেই শুধু অবক্ষয়ের লক্ষণ ফুটে উঠতে দেখি। সব সা হিত্যশাখাই অতিব্যবহারে গতানুগতিক হয়ে গেছে। শিক্ষার অভাবে বিকৃত চির তখন জয়জয়কার। কবিগানের আসরে অশ্লীলতাই তখন কাম্য রস। জাতির মানসক্ষেত্রে মাঝে মাঝে নবভাবের বর্ষণ না ঘটলে তা কতদুর উষর হতে পারে বাংলায় অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ তার যথার্থ উদাহরন। এই শতকের বিষয়ে দুই মনীষির উদ্ধৃতি দিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গ সমাপ্ত করা যেতে পারে।

১) As we have the 18th century behind us we feel the presence in the literary region of a certain spirit of decadence though there is much brilliance in it. The acknowledged master is Bharatchandra (1710-60). The prince of those who have perfect control over the machinery of words, in whose hands words sway and tremble, but the theme reveals the decadent nature within. Only the corruptions of the society are treated as fit subjects for representation."

- Western Influence on Bengali Literature : Sushil K. De.

২) পল্লীসমাজের বুকে বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও সাহিত্য জন্মলাভ করেছিল তা ছেড়ে এবার ইংরেজ আমলে তার নূতন আসর রচনা হচ্ছে ইংরেজের তৈরী কলকাতা শহরে। মহাশক্তিশালী বণিক সভ্যতার আঘাতে ভারতের পল্লী অর্থনীতি ও পল্লী সমাজ ক্রমশঃ ভেঙে যাবে। নূতন বণিক সভ্যতার অবাধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক দানে, ইউরোপীয় সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসাদে বাঙ্গালী মানসেও কালান্তর সমাসন্ন হবে, নূতন সভ্যতার আস্ব াদনে বাঙ্গালী প্রাণচঞ্চল হবে। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জীবন থাকবে উপনিবেশিক সমাজের অর্থনীতিক ও রাজনৈতিক নিগড়ে আবদ্ধ। উদ্যোগ অধিকার বঞ্চিত সেই বাঙালী উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের পরিচালনায় এর রূপ অপরিসর জীবন ক্ষেত্র থেকে বাঙ্গালীসংস্কৃতি কিরূপে আহরণ করবে স্বদেশীয় প্রাণরস ও গ্রহণ করবে আধুনিক সভ্যতার দিগ্‌দেশ প্লাবী আশীর্বাদ, নূতন জীবনযাত্রা, নূতন জীবনাদর্শ এবং নূতন সাহিত্যাদর্শ — সেই প্রশ্নেরই উত্তর বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ।

— বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা গোপাল হালদার।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com